পশুপাখিদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

সুমন ভট্টাচার্য

সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতীদের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান বারবার ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগতে সকলের প্রতিই তাঁর অসীম করুণা। শুধু যে মানুষের প্রতি তাঁর কৃপাবারি বর্ষিত হয় তা নয়, বরং মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি তাঁর করুণা শত ধারে ঝরে পড়তে দেখা গেছে বারবার। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'অবতারবরিষ্ঠ'। শ্রীরামকৃষ্ণ এক দিব্যচৈতন্যময় জগতে সর্বদা বিরাজ করতেন। ''বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন...।''[১]

দক্ষিণেশ্বরে একবার একটি কুকুরের অনেকগুলি ছানা হয়। কয়েকদিন পর কুকুরটি কঠিন রোগে মারা যায়। মায়ের দুধ না পেয়ে অনাথ ছানাগুলি খুব কষ্টে রাতদিন এক জায়গাতেই শুয়ে থাকে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সেই পথে আসছিলেন কুকুরছানাগুলি তাঁর পায়ের কাছে এসে কাঁইকুঁই করে কাঁদতে লাগল। তিনি করুণাপরবশ হয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর নিজের ঘরে গেলেন। কিছু পরেই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তাঁর ঘরে এসে একজন খবর দিল, কোথা থেকে একটি কুকুর এসে ছানাগুলিকে দুধ খাওয়াতে শুরু করেছে। কুকুরটির চেহারা, রং এবং মুখ আগের কুকুরটির মতো। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বড়ই তুষ্ট হলেন—

''শুনিয়া বড়ই তুষ্ট প্রভুদেবরায়।
বলিলেন সব হয় শ্যামার ইচ্ছায়॥
জগতের যেখানেতে যতবিধ প্রাণী।
সকলে সমানচক্ষে দেখেন জননী॥''[২]

দক্ষিণেশ্বরে একটি কুকুর ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে কাপ্তেন বলে ডাকতেন। সে প্রায়ই মা ভবতারিণী মন্দিরের সামনে চাতালে বসে থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ কাপ্তেনকে ডাকলেই সে এসে তাঁর পায়ে গড়াগড়ি দিত, তিনি তাকে লুচি সন্দেশ খেতে দিতেন। বলতেন, ''দেখ, এত যে কুকুর রয়েছে, কই কেউ তো মায়ের সামনে বসে না। গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে এর মতো কই কাকেও তো দেখিনি। এ কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে, ওর পূর্ব জন্মের সংস্কার যা ছিল, তাই এখানে এসে করছে, ধন্য হয়ে গেল।''[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে

বলেছিলেন, ''এখানকার (দক্ষিণেশ্বরের) কুকুর বেড়াল পর্যন্ত ধন্য হয়ে গেল। দেখ না মায়ের প্রসাদ খাচ্ছে, গঙ্গা দর্শন করছে, গঙ্গা জল খাচ্ছে, মন্দিরের চারিদিকে যাওয়া আসা করছে।''[৪]

দক্ষিণেশ্বরে একবার একটি বিড়াল তার ছোট ছোট ছানাদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরটিতে আশ্রয় নিল। তাদের জন্য বেজায় চিন্তায় পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবদ্‌ভাবে যিনি সর্বদা তন্ময়, মুহুর্মুহু যিনি অনায়াসে গমন করেন সমাধিলোকে, পরমানন্দে সদাই লীন যাঁর মন—তিনিই আবার ক্ষুদ্র অসহায় এই প্রাণীটির জন্য চিন্তায় ব্যাকুল! শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছেন কীভাবে এই বিড়াল ও তার ছানাগুলির জন্য সামান্য দুধ ও মাছের ব্যবস্থা করা যায়। এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে এলেন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী। পরে তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন : ''জন্তুরাও তাঁর স্নেহপূর্ণ আশ্রয় পেত। একবার একটি বিড়াল তার তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আশ্রয় নিল। মা-বিড়ালটি কখনো কখনো তাঁর খাটের উপরে তাঁর পায়ের কাছে শুত আর যদি তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতেন, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ে তাঁকে যেন প্রণাম করত। ঠাকুর বিড়াল ও তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে কি করবেন এই ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন, কারণ তাঁর ধারণা হলো ওরা মন্দিরে উপযুক্ত খাবার পায় না। তাই একদিন আমি তাঁকে দর্শন করতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার জন্য কিছু করবে?' আমি হাত জোড় করে তাঁকে বললাম, 'সে যাই হোক না কেন, আমি করব।' কিন্তু তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন আর আমিও পূর্বের মতো উত্তর দিলাম। তখন তিনি বিড়ালগুলো সম্বন্ধে আমাকে বললেন এবং ওদের বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন, 'মনে রেখো, ওরা আমার আশ্রয় নিয়েছে, অতএব দেখো ওরা যেন আদর-যত্ন পায়।'

''আমি ওদের বাড়ি নিয়ে গেলাম এবং যখনই দক্ষিণেশ্বরে যেতাম তিনি বিড়ালগুলো সম্বন্ধে খুঁচিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন—ওরা কি ঠিকমত খাবার পাচ্ছে? বাচ্চাগুলো কি বড় হয়েছে? ওদের নিয়ে আমি কি করতে চাই? তিনি চিন্তিত ছিলেন যে আমি হয়তো ওদের আর কারুকে দিয়ে দেব আর সে ওদের আদর যত্ন করবে না। তিনি আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'মনে রেখো, ওরা আমার আশ্রয় নিয়েছিল।' মা-বিড়ালটির আর বাচ্চা হয় নাই। বছরের শেষে বিড়ালটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেল। তার মারা যাবার সময় আমি তার মুখে গঙ্গাজল ঢেলে দিলাম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করলাম।''[৫]

একবার কামারপুকুরে বর্ষার সময় সকলে মাছ ধরায় ব্যস্ত। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সে-পথ দিয়ে জলকাদা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, একটি বড় মাছ তাঁর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। তিনি কৃপাপরবশ হয়ে মাছটিকে তুলে জলে ছেড়ে দিলেন। মাছটিকে সান্ত্বনা দিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, ''ঘরে যা, আর তোর কোন ভয় নাই।'' এই বলে যেখানে মাছটির ছানা পোনা রয়েছে, সেখানে মাছটিকে ছেড়ে দিলেন।[৬]

আর একদিন ভূতির খালের দিক থেকে আসছেন, একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে। একটা মাগুর মাছ পুকুর থেকে রাস্তায় উঠে এসে ঠাকুরের পায়ে ঠেকেছে। পরম দয়াল শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে পায়ে করে ঠেলে ঠেলে এনে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ''পালা, পালা, হৃদে দেখতে পেলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবে।'' আবার ফিরে এসে হৃদয়কে বলছেন, ''হৃদু এই এত বড় একটা মাগুর মাছ, হলদে রং, রাস্তায় উঠেছিল, পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'' শুনে তো হৃদয়রামের আফশোসের সীমা-পরিসীমা রইল না। বলতে লাগলেন, ''ও মামা, তুমি কি গো, ও মামা, তুমি কি গো! আঃ, এত বড়

মাছটা ছেড়ে দিলে! আনলে বেশ ঝোল হতো।"[৭]

স্বামী অখণ্ডানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, ''ঠাকুর বরানগরের বেণীপালের ভাড়াটে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি ছাড়া কখনো কোথাও যেতেন না। তার ঘোড়া ভাল ছিল, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ—এই তার কারণ। ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেই ঠাকুর অস্থির হয়ে উঠতেন। বলতেন, 'আমাকে মারছে।' তাই বেণীপাল যখন শুনতেন যে পরমহংসদেবকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন যা খুব ভাল ঘোড়া তাই দিতেন—যাকে মারতে হবে না, একটু পা নাড়লেই ছুটে চলবে।"[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এসে বেশ কিছুদিন ছিলেন। বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ আসতেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। তাঁর দর্শনমাত্রেই এক দিব্য আনন্দে পূর্ণ হত সকলের প্রাণ। এসময় বহু পাখিও আসত তাঁকে দর্শন করতে। পাখিরা তাঁর শরীরে নির্দ্বিধায় বসে থাকত। তাদের বিন্দুমাত্রও ভয় ছিল না। কারণ তারা বুঝতে পারত জগতের সবথেকে নিরাপদ ও কাঙ্ক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। সারাদিনের কাজের শেষে চাষিরা প্রাণ জুড়োতে আসত কামারপুকুরের গদাধরের কাছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের কাছে গাছের ডালের পাখিদের কথোপকথন ব্যাখ্যা করে আনন্দ দিতেন।

''জীব জন্তু কেহ তাঁয় ভয় নাহি করে।
পাখী এসে উড়ে বসে শ্রীঅঙ্গ উপরে॥
সবাকার ত্রাসনাশ প্রভু ভগবান।
উঠিল সবার হৃদে আনন্দ-তুফান॥...
কাক-কাকী নিকটস্থ বসে বৃক্ষডালে।
উভয় উভয় প্রতি কেবা কিবা বলে॥
সকল শুনেন প্রভু সহাস্য বদন।
পক্ষিভাষ বুঝিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ॥
ভাঙ্গিয়া দিতেন পুনঃ কৃষাণের দলে।
কাক-কাকী পরস্পর কে কি কথা বলে॥"[৯]

দাসভাবের পরাকাষ্ঠা হনুমানের একটি পট শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, ''দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বলল :

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে॥
শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই।
ফলের কথা কই, (ধনি গো), ও ফল গ্রাহক নই;
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে॥"[১০]

রামভক্ত হনুমানের ত্যাগী ও সংযমী জীবনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

একবার বালক গদাই কামারপুকুর থেকে তাঁর মামার বাড়ি মায়াপুর যাচ্ছিলেন মায়ের কোলে চেপে। পথে একটি গাছে কিছু হনুমান বসে ছিল। শিশু তাদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ে ছুটে সেই হনুমানগুলির কাছে চলে গেলেন। হনুমানগুলি কিন্তু গদাইকে তাড়া করল না, বরং তারা আনন্দে বালকের সঙ্গে খেলা করতে লাগল। মা চন্দ্রমণি দেবী তো ভয়েই অস্থির। কারণ সাধারণত এই হনুমানেরা দাঁত দেখায় এবং কেউ কাছে গেলেই তাকে তাড়া করে, আঁচড়ে কামড়ে দেয়। কিন্তু গদাধরকে পেয়ে তারা সেসব কিছুই করল না। পুঁথিকার বলেছেন, নিশ্চয়ই তারা গদাইয়ের মধ্যে তাদের চিরকালের আরাধ্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছিল।[১১]

একবার শ্রীরামকৃষ্ণের খুব ইচ্ছে হল কুমড়ো খাওয়ার। কিন্তু তখন কুমড়োর সময় নয়। সমস্ত

গ্রাম খুঁজেও তাঁর দুই ভাগিনেয় হৃদয় ও রাজারাম একটিও কুমড়ো খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তাঁরা এক বৃদ্ধার ঘরের খড়ের চালের উপর একটিমাত্র কুমড়ো দেখতে পেলেন। কিন্তু বহু অনুরোধেও বৃদ্ধা কুমড়োটি দিলেন না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে ঘটল এক আশ্চর্য কাণ্ড। কোথা থেকে এক বীর হনুমান এসে তাঁদের সামনে সেই কুমড়োটি রেখে লাফ দিয়ে সেখান থেকে পালাল। হৃদয় ও রাজারাম বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবান রামচন্দ্রের কুমড়ো খাওয়ার বাসনা পূরণ করতেই হনুমানটি এই কাজ করল।[১২]

জগতের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একাত্মবোধ প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম ত্যাগী পার্ষদ স্বামী সারদানন্দের একটি মন্তব্য স্মরণ করে আমরা এই আলোচনায় ইতি টানব—''ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক পৃথক যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এ বিষয়ে ঠাকুর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনি-সকলের যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন।"[১৩] ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভাগ ১, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫১-৫২

২।অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৫) পৃঃ ৪১৯ [এরপর, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি*]

৩।সম্পাদক ও সংকলক স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ২৮ [এরপর, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*]

৪। তদেব

৫। তদেব, পৃঃ ৩২৩-৩২৪

৬। *দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি*, পৃঃ ১৩৯

৭।*শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫) অখণ্ড, পৃঃ ১৯২

৮। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ২১১

৯। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি*, পৃঃ ১৮৪

১০। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৩০

১১। *দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি*, পৃঃ ১২-১৩

১২। দ্রঃ তদেব পৃঃ ১৮৭

১৩। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ১৪০